Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 458 – 466
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

মানবতার প্রতীক : রাজা রামমোহন রায়

ড. প্রবাল কুমার সিংহ
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রামপুরহাট কলেজ
ইমেইল : prabal123sinha@gmail.com

Keyword
রাজা রামমোহন রায়, নবজাগরণ, নারীবাদ, মানবতাবাদ, সমাজসংস্কার।

Abstract
মানুষের প্রকৃত ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থহীন স্বার্থকেন্দ্রিক আচারের বেড়াজালে মনুষ্যত্ব যখন বন্দিদশা যাপন করে তখন মনুষ্যত্বকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে আবির্ভাব হয় বিভিন্ন মনীষীদের। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে ভারত সেই রকমই এক কালিমালিপ্ত অবস্থায় বিরাজ করছিল। ভারতবর্ষের আসল সত্যকে আবৃত করে রেখেছিল কিছু স্বার্থান্বেষী, রক্ষণশীল মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। আর ঠিক এমন সময়ে ভারতবর্ষের বুকে জন্মগ্রহণ করলেন সত্যের মশাল হাতে রাজা রামমোহন রায়। যেন ভারতবর্ষের এই মৃতযুগের অবসানের জন্যই তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। সমাজে মানুষের কুসংস্কার, অন্ধতা ও রক্ষণশীলতা যখনই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তখনই সমাজ গভীর অন্ধকারে ডুব দেয়। আর সেই অন্ধকার থেকে সমাজকে আলোর পাড়ে টেনে তুলে আনার জন্য প্রয়োজন হয় মনীষীদের। যাঁরা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে শেখাবেন ও সত্যের পথ দেখাবেন। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিভিন্ন কুসংস্কারের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল এবং বন্দিদশা যাপন করছিল। যা রাজা রামমোহন রায়কে ভীষণভাবে চিন্তিত ও ব্যথিত করে তুলেছিল। মানুষের প্রকৃত ধর্ম যে মানবধর্ম তা মানুষ প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, কুলীন প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি কুপ্রথাগুলি সেই সময় সমাজকে কালিমালিপ্ত করে রেখেছিল। এই সময় এই সমস্ত কুপ্রথাগুলির দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নারীরা। সমাজ নারীদেরকে শুধুমাত্র নারী করেই রেখেছিল। মানুষ হিসাবে কখনোই স্বীকৃতি দিতে পারেনি নারীদেরকে। যার কারণে তারা নারীদেরকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করার কৌশল তৈরী করেছিল। যেমন - সতীদাহ প্রথা। এই পৈশাচিক প্রথার দ্বারা নারীর বাঁচার অধিকারকে নারীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল গোঁড়া হিন্দু সমাজ। এর পেছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল সেই বিধবা নারীটিকে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এই পৈশাচিক প্রথার বিরুদ্ধে মানবতাবাদী রাজা রামমোহন রায় দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন এবং সফলতাও অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি সমাজের অন্যান্য প্রথাগুলির বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার জন্যও চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, একমাত্র শিক্ষার আলোই পারে কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিতে। রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের বিভিন্ন

আচার, প্রথা, রীতি-নীতির ছিলেন তীব্র বিরোধী। তিনি ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মকে তিনি স্বীকার করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলি পড়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানবধর্মই হল সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মূলভাব। রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তি, চিন্তা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি সমস্ত কিছুই ছিল মানবতাবাদ। মানবতাকেই তিনি মানুষের ধর্মরূপে স্বীকার করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্মের সংস্কারের দ্বারা তিনি সমাজের সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। তিনিই হলেন প্রথম আধুনিক মানুষ। তিনি মানবতাকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতেন। তাঁর মানবতাবাদ আজও সমাজে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর হাত ধরেই ভারতের বুকে প্রথম নবজাগরণ আসে।

Discussion

ভূমিকা — আমরা সবাই সমাজবদ্ধ জীব। কারণ সমাজই আমাদেরকে আমাদের পরিচয় প্রদান করে। আবার এই সমাজ গঠিত হয় আমাদেরকে নিয়েই। কিন্তু বিভিন্ন সময় এই সমাজ কলুষিত হয়ে যায় আমাদেরই বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্বারা। অনেক সময় আমাদের জন্যই এই সমাজের মধ্যে দেখা দেয় বিভিন্ন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ইত্যাদি। যার ফলে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিভিন্ন মনীষীরা সমাজের এহেন অবস্থায় গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিজ নিজ কাঁধে তুলে নেন। উনবিংশ শতককেই ভারতের নবজাগরণের সময় বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন মনীষীরা ছিলেন এই তালিকায় যেমন — রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়া ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ। তবে এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়কেই ভারতে নবজাগরণের পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। কারণ তাঁর হাত ধরেই ভারতে প্রথম নবজাগরণ অর্থাৎ, সমাজে পরিবর্তন আসে। মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম হল মানবধর্ম। এটিকে একটি দর্শন বলা যায়। এটাকে অর্জন করতে হয়। নবজাগরণের ফসলই হল মানবতাবাদ। আর যাঁরা এই নবজাগরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন মানবতাবাদী। মানবতাবাদ হল এক প্রকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের কল্যাণ সাধনই হল এর লক্ষ্য। এই নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় মানবতাবাদকে যেভাবে ভারত তথা বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন তা সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ এবং বর্তমান সমাজে আজও তা সমভাবে প্রাসঙ্গিক। রাজা রামমোহন রায় কিন্তু কালের অতীত বা পুরাতন হয়ে যাননি, তিনি নতুন ছিলেন, নতুন হয়ে রয়েছেন এবং চিরকাল নতুন ও আধুনিক হয়ে থাকবেন। তাঁর চিন্তা যেন কালের সীমাকে অতিক্রম করে গেছে। আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ কালেই এসেছেন রাজা রামমোহন রায়।[১]

মূল বিষয় — মানুষকে হওয়া উচিত মানবতাবাদের পূজারী। মানবতাবাদের জন্যই তো মানুষ অপরাপর প্রাণী থেকে পৃথক। আর মানুষের প্রকৃত ধর্মও হওয়া উচিত এই মানবতাবাদ। 'ধৃ' ধাতুর সাথে 'মন' প্রত্যয় যোগ করে 'ধর্ম' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ হল ধারণ করা আর 'মন' প্রত্যয়ের অর্থ হলো অতিশয়। সুতরাং 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা ব্যক্তিকে, সমাজকে, বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে তাকে ধর্ম বলা হয়।[২] মানুষের ধর্মকে আমরা মনুষ্যত্ব বলতে পারি। যাকে কিনা সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হয়। জন্মসূত্রে এটা পাওয়া যায় না। আমাদের সমগ্র জীবনই হল মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই মানবতার বাণী প্রচারে অগ্রণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন আমাদের দেশের মনীষীবৃন্দ। এক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। এছাড়াও যাঁরা এই মানবতার বাণী সকল মানুষকে শুনিয়েছিলেন তাঁরা হলেন চৈতন্যদেব, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামীজি, শ্রী অরবিন্দ, লালন ফকির, স্বামীজি প্রমুখ।

১৭৭২ সালের ২২শে মে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩] শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায়, মননশীলতায়, যুক্তিশীলতায় ছিলেন তিনি ভরপুর। বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। বিভিন্ন ভাষায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেন। যেমন– হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি। আরবি, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ফরাসি, ইংরেজি বিভিন্ন ভাষা তিনি শিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা শুরু করেন কলকাতায় এবং

পরবর্তীতে তা শেষ করেন কাশিতে। তখনকার ইসলামী বিদ্যা চর্চার পীঠস্থান ছিল পাটনা। সেখানে গিয়ে তিনি আরবি ভাষা ও মুসলিম শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।[৪] এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছিলেন এবং করেও ছিলেন। এরপর নিজের জ্ঞান ভান্ডার পূর্ণ করার পর তিনি সমস্ত বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে এবং যাচাই করতে চেয়েছিলেন। এরই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই তার সুগভীর যুক্তিশীলতার প্রভাব পড়ে তৎকালীন ধর্মীয় বিশ্বাসে।

কোরান, হাদিস, সুফিবাদ প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় একেশ্বরবাদে। মূর্তি পূজায় তাঁর বিশ্বাস আর থাকে না। যার ফলে পরিবারের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং ফলস্বরূপ ১৯৮৮ সালে তাঁর গৃহত্যাগ।[৫] এরপর বিভিন্ন জায়গায় তিনি পর্যটন করেন এবং পিতার আহ্বানে আবার ফিরে আসেন নিজ গৃহে। এরপর তিনি কাশিতে যান। সেখানে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়গুলিতে জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হন। উপনিষদ, ভগবদ্ গীতা এবং বিভিন্ন ভাষ্যসহ ব্রহ্মসূত্র - এই প্রস্থানত্রয়ে অর্থাৎ শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থানে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন তিনি। এরফলে তাঁর মধ্যে উৎপন্ন হয় অখন্ডতার প্রতি এক দৃঢ় বিশ্বাস আর মূর্তি পূজার প্রতি এক বিরোধমূলক মনোভাব এবং উৎপন্ন হয় ব্রহ্মে বিশ্বাস অর্থাৎ নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষে, এক ও অদ্বয় তত্ত্বে বিশ্বাস। একেশ্বরবাদের প্রতি তাঁর উপহারস্বরূপ তিনি রচনা করেন ফরাসি ভাষায় তুহ্ফাতুল মুওয়াহিদ্দিন। এছাড়া তিনি ইংরেজিতেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ফরাসি ভাষায় তিনি একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন যার নাম ছিল মীরাৎ- উল-আখবর। এছাড়াও বিভিন্ন বিচারবিষয়ক, বিতর্কবিষয়ক, কিছু মৌলিক রচনা, কিছু অনুবাদগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। বিভিন্ন উপনিষদের বাংলা ভাষ্য তিনি রচনা করেন। যেমন – কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মান্ডুক্যেপনিষদ ইত্যাদি। বেদান্তের ব্রহ্মবাদ স্থাপন করতে চেয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রথম সূচনা করেন রাজা রামমোহন রায়।[৬] এটিকে একটি আন্দোলন বলা যায়। কারণ এর দ্বারা তিনি সমাজ ও ধর্ম উভয়েরই সংস্কার সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে নিজের কিছু অনুগামী ও বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মসভা। দু বছরের মধ্যে যখন এই সভার সদস্য সংখ্যা বহু বেড়ে গেল তখন তিনি এই ব্রাহ্মসভার নাম পরিবর্তন করে রাখেন "ব্রাহ্মসমাজ"।[৭] এটিকে গঠন করার পেছনে কারণটি হল রাজা রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদের প্রতি বিশ্বাস। যা তাঁর মধ্যে গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে। ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠার পূর্বে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আত্মীয়সভা। এর পশ্চাতেও বেদান্তের এই একেশ্বরবাদের ভাবনাই নিহিত ছিল। বেদের অন্তভাগকে বেদান্ত বলে। আর উপনিষদ যেহেতু বেদের অন্তভাগ তাই উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়। বেদান্তে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা উপনিষদে চারটি মহাবাক্যের উল্লেখ পাই। এগুলি হল— ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই 'তত্ত্বমসি', বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি', ঐতরেয় উপনিষদে পাই 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' আর মান্ডুক্য উপনিষদে পাই 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। এই সবকটি মহাবাক্যের তাৎপর্য হল - জীব ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেও এই একই তাৎপর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমরা সকলেই সকলের আত্মীয়। কারণ সকলেই ঐ পরমাত্মার সন্তান এবং সকলেই ওই পরমাত্মার অংশবিশেষ। এই ভাবনাই ছিল আত্মীয়সভা গঠনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন মামলার জটিলতার কারণে আত্মীয়সভার অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই আত্মীয়সভারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হল ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠা। এই ব্রাহ্মসভার মূল উদ্দেশ্য ছিল —

১. বেদান্ত দর্শনের উপর ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা।
২. একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা।
৩. মূর্তি পূজার বিরোধিতা।
৪. সর্বধর্ম সমন্বয়।

রাজা রামমোহন রায় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কুসংস্কার বলে মনে করতেন।তিনি এক ব্রাহ্মণ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেও কিন্তু অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্য প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, ধর্মের নামে অন্ধতা, কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির ছিলেন তীব্র বিরোধী। যার কারণে তাঁকে বহুবার নিন্দিত হতে হয়েছে তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ দ্বারা। তিনি সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণ- অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধের কোন মূল্য নেই। যেমন– মূর্তিপূজা, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ প্রভৃতি। মনুষ্যত্বই মানুষের একমাত্র ধর্ম। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী রাজা রামমোহন রায়ের মতে, আমরা সকলে পরমাত্মার সন্তান। তাই ধর্ম সংস্কারের জন্য এই মূঢ় সংস্কারগুলির উচ্ছেদ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর, ধর্মের সংস্কারের দ্বারাই তিনি সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ বলা যায় রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম সংস্কার। মানুষের প্রকৃত ধর্ম হল মানবতাবাদ যেখানে স্বীকৃত হবে সকলের কল্যাণ, সকল মানুষের সমতা। কোনো দিক থেকেই মানুষে মানুষে কোনো প্রকার ভেদাভেদ স্বীকৃত হবেনা সেখানে। সমাজ এবং ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।মূঢ় সংস্কার বিরোধী মনোভাব, বহু ঈশ্বর বিরোধী মনোভাব ও পৌত্তলিকতা বিরোধী মনোভাব ইত্যাদির দ্বারা তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে ওঠে। এ ভাবেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন ভারতে।

নবজাগরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল রেনেসাঁস। যার অর্থ হল সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন। যা পাওয়া যায় বিবর্তন ও বিপ্লবের পথ ধরে বহু কষ্টে। এটিকে নবজন্ম বা পুনর্জন্মও বলতে পারি আমরা। সমাজের প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস, মূঢ় সংস্কারকে বৌদ্ধিক আলোচনা ও যুক্তিতর্কের কোষ্ঠী পাথরে বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ ও বর্জনকে বলা হয় নবজাগরণ। প্রচলিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞানতার অন্ধকার কাটিয়ে জ্ঞানের আলোয় জেগে ওঠাকেই আমরা নবজাগরণ বলি। এই নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

১. **যুক্তিবাদের বিকাশ** : প্রচলিত সমস্ত কুসংস্কারের গণ্ডিকে পার করে আলোর দিকে অগ্রসর হওয়া যায় শুধুমাত্র যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ এর মাধ্যমেই। তাই নবজাগরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল যুক্তিবাদের বিকাশ। কারণ যুক্তিবাদ বিকাশ লাভ করলে তবেই মানুষ সঠিক পথ নির্বাচন করতে সক্ষম হয়।

২. **বিজ্ঞান চর্চার প্রসার** : বিজ্ঞান চর্চার দ্বারাই মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারে। মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবে যেকোন বিষয়কে জানতে চায়। কোন কিছুকেই বিনা বিচারে মানুষ মেনে নিতে চায় না।

৩. **মানবতাবাদ** : নবজাগরণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানবতাবাদ। মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্য দেওয়ার কারণেই একজন মানুষ অমানবিক কুসংস্কারগুলির বিরোধী হয়ে ওঠে।

৪. **স্বাধীন চিন্তার বিকাশ** : যখন কোনো মানুষের নির্বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সরে যায় তখন তার সবিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়। আর যার ফলে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ তার মধ্যে ঘটতে থাকে।

৫. **সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন** : নবজাগরণের ফলে সাহিত্যেও নতুন নতুন বিভিন্ন বিজ্ঞানমুখী, মানবমুখী লেখা শুরুর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাতেই প্রথম দেখা দেয় নবজাগরণের একটি ধারা। রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরেই এই নবজাগরণের ধারা শুরু হয়। তাই ভারত তথা বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম বিজ্ঞানচেতা, মানবতাবাদী, আধুনিক পুরুষ। মানবতাবাদ নবজাগরণেরই শ্রেষ্ঠ অবদান।

মানবতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Humanism যা লাতিন শব্দ Humanitas থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Humanitas - এর অর্থ হল জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। সুতরাং মানবতাবাদ এর পূর্ণ অর্থ হল যা মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে সূচিত করে তাই হল মানবতাবাদ।[৮] মানুষের প্রকৃত ধর্ম হওয়া উচিত মানবধর্ম। এর মূলভিত্তি হল মানবতাবাদ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলিতেও কিন্তু মানবতাবাদের কথাই বলা হয়েছে। মানবতাবাদে মানুষই হল প্রধান। আর তাতে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ইচ্ছা, অনুভূতি, আনন্দ ইত্যাদি-ই প্রাধান্য পায়। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তি প্রধান্য পায়। এছাড়া বিজ্ঞানচর্চা প্রাধান্য পায়। মানবধর্ম মানুষকে সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হয়। এটি হল বিশ্বকল্যাণের

আদর্শ। আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সকলের কল্যাণচিন্তা ও সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য দেওয়ার দ্বারাই আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব।

তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে যে সমস্ত কুপ্রথাগুলি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে সবথেকে ভয়ানক ও মর্মান্তিক প্রথা ছিল সতীদাহ প্রথা। আর এই সতীদাহ প্রথার অবসান-ই হল রাজা রামমোহন রায়ের এক অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ ও কৃতিত্ব। তাঁকে আমরা ভারতের আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলতে পারি।[৯] নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা যখন তৎকালীন সমাজে ছিল চিন্তারও অতীত তখন রাজা রামমোহন রায় এই অসাধ্য সাধন করে দেখালেন। তাই নারী মুক্তি আন্দোলনের কথা বলতে গেলে যাঁর নাম সর্বপ্রথম আমাদের মাথায় আসে তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। নারীরাও যে মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা তিনি সমাজকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কারণ পুরুষদেরকেই তৎকালীন সমাজ মানুষ শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করত। আর নারীরা তো কেবল নারী তৎকালীন সমাজের কাছে।

তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথাকে সহমরণ বা সহগমনও বলা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবা নারীটিকে তার স্বামীর জ্বলন্ত চিতাতেই আত্মাহুতি দেবার প্রথাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়। অর্থাৎ স্বামীর চিতায় তার স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারার এক অমানবিক প্রথা। আবার যদি দেখা যেত যে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী কোন কারণবশত দূরে বসবাস করছে তাহলে সেই স্ত্রী তার স্বামীর ব্যবহৃত কোন একটি জিনিস যেমন – জুতো, চাদর, লাঠি ইত্যাদি যেকোনো জিনিসসহ স্বামীর চিতায় আরোহন করতেন। এটাকে বলা হত অনুমরণ। অনুমরণ সহমরণেরই একটি প্রকার বলা যায়। স্বামীর চিতায় সহমরণকারী স্ত্রীটিকে সতী বলা হত। পুণ্যের আশায় অনেক নারী স্বেচ্ছায় এই সহমরণে যেতেন। আবার অনেকে বিধবা জীবনের সম্ভাব্য দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা, অবজ্ঞার কারণেও সহমরণে প্রবৃত্ত হতেন। আর যারা স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতেন না তাদেরকে তৎকালীন সমাজ বলপূর্বক সহমরণে যেতে বাধ্য করত। সহমরণকালে অন্যান্য সধবা স্ত্রীরা সতীর পদধূলি এবং সতীর পায়ের আলতার ছাপ সংগ্রহ করত। অগ্নিদগ্ধ হবার সময় সতীর চিৎকারকে আবৃত করার জন্য সেই সময় শ্মশানে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘন্টা বাজানো হত। আর শ্মশানে উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গ এক অমানবিক ও পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠত। মনে করা হতো স্বামীর চিতায় সহমরনে গেলে ওই বিধবা নারীটি মৃত্যুর পরও নাকি তার স্বামীর সাহচর্য পাবে। আর এই বিষয়টি সদ্য বিধবাটিকেও বোঝানো হত আর তাকে সহমরণে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করা হত। সদ্য বিধবা স্ত্রীটিকে নববধূর সাজে সাজিয়ে তার স্বামীর চিতায় বসিয়ে দেওয়া হত। নিষ্ঠুর এই প্রথার কথা বর্তমানেও যখন আমরা আলোচনা করি তখনও আমাদের সকলেরই লোমহর্ষকের অভিজ্ঞতা হয়। কি নিষ্ঠুর প্রথা! এ যেন ছিল এক পৈশাচিক প্রথা। কুলিন প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রথার কারণে বহু শিশুকে এই সহমরণে যেতে হয়েছিল তার বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর পর। এই প্রথার পিছনে সম্ভবত তৎকালীন সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীকে বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত করা। সম্ভবত মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে তার সদ্য বিধবা স্ত্রীটিকে বঞ্চিত করাই ছিল এর একটি অন্যতম কারণ। তাছাড়া সেই বিধবা নারীর ভরণপোষণের দায় এড়ানোও ছিল তৎকালীন সমাজের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

মানবতাবাদী ও মানবহিতৈষী রাজা রামমোহন রায় অমানবিক ও পৈশাচিক এই সতীদাহ প্রথাটিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টায় আপ্রাণ লড়াই শুরু করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারেরও এই কুপ্রথার উপর দৃষ্টি পড়েছিল। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের দাদা জগমোহন রায়ের অকাল প্রয়াণের পর তাঁর স্ত্রী অলকামঞ্জুরীকে জোর করে সহমরণে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।[১০] এই ঘটনাটি রাজা রামমোহন রায়কে ভীষণভাবে ব্যথিত ও গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বৌদির এই মর্মান্তিক পরিণাম তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। সেই সময় তিনি শপথ নিয়েছিলেন, বৌদি, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, কিন্তু হিন্দুদের এই বর্বরতা আমি নাশ করবই।[১১] বলা যেতে পারে যে, বৌদির সহমরণই ছিল সতীদাহ প্রথা রদে রাজা রামমোহন রায়ের প্রেরণা।

উনিশ শতকে ভারতবর্ষের নবজাগরণের সময় বিভিন্ন কুসংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ১৮২৯ সালের 'সতী নিবারক আইন'(Sati Prohibition Act, 1829)।[১২] এই আইনটি ছিল রাজা রামমোহন রায়ের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই প্রথা উচ্ছেদ করার পূর্বে মানুষকে আগে বোঝাতে হবে যে এটি শাস্ত্রসম্মত আচার বা প্রথা নয়। কারণ, তা না হলে এটা রোধ করা খুব একটা সহজ হবে না।তাই তিনি শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন যুক্তি নিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন এবং জনমত গঠন করার চেষ্টা করলেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছিলেন। আর এর জন্য তিনি লোকশিক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।এই প্রথাটিকে একটি সামাজিক ব্যাধি বলা যেতে পারে যেটিকে মানুষ অন্ধভাবে মেনে চলেছে বহু যুগ যুগ ধরে। তাই তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন এই প্রথাকে নির্মূল করতে। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রথা পুরোপুরি অশাস্ত্রীয় ও হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী। হিন্দুশাস্ত্র থেকে যুক্তি তুলে নিয়ে তিনি বলেন —

১. মৃত স্বামীর সঙ্গ লাভের আশায় সহমরণ আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এই আত্মহত্যার পেছনে কাজ করছে কিন্তু লোভ। আর লোভ ও আত্মহত্যা উভয়ই শাস্ত্র অনুযায়ী মহাপাপ। তাছাড়া শাস্ত্রে বিধবা নারীদের ব্রহ্মচার্য পালনের নির্দেশ আছে।

২. সতীদাহের মাধ্যমে নারীরা মুক্তিলাভ করে — সমাজের এই যুক্তিও কিন্তু ভিত্তিহীন। কেননা, মুক্তি নয় বরং স্বর্গে গিয়ে সুখ লাভ হয় নারীর। তাই একমাত্র ব্রহ্মচর্যরূপ কৃচ্ছসাধনের দ্বারাই মুক্তি লাভ সম্ভব হতে পারে।

৩. স্বামীর মৃত্যুর পর সেই মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে তার স্ত্রীর অধিকার বর্তায়। বঞ্চিত করার মনোবাঞ্ছা নিয়েই তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজ নারীকে সহমরণে যেতে বাধ্য করত। যাতে করে সেই বিধবা নারীটিকে সম্পত্তির অধিকার দিতে না হয়। তাই সম্পত্তি আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজনরা বিধবা নারীটিকে সহমরণে যেতে উৎসাহ দিত অথবা বাধ্য করত।

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে, যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ সতীদাহ প্রথাকে শাস্ত্রসম্মত হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল রাজা রামমোহন রায় সেই শাস্ত্র থেকেই যুক্তি নিয়ে দেখালেন যে এই সতীদাহ প্রথা পুরোপুরি অশাস্ত্রীয় এবং রক্ষণশীল সমাজের সমস্ত যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। এই সমস্ত যুক্তির দ্বারাই রাজা রামমোহন রায় জনমত গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি সে বিষয়ে সফলও হয়েছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র তিনি তৎকালীন সরকারের কাছে জমা দেন এই প্রথার বিরুদ্ধে। আর, সরকারকে এই কুপ্রথা সম্পর্কে অবহিত করারও চেষ্টা করেন। এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য 'সংবাদ কৌমুদী' নামক এক পত্রিকায় তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। এছাড়াও এ বিষয়ে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদ (১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

এছাড়াও যে মুহূর্তে তিনি সতীদাহের কোন খবর পেতেন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যেতেন আর চেষ্টা করতেন যাতে করে এটা আটকানো যায়। কিন্তু এর ফলস্বরূপ তাঁকে বহুবার অপমানিত হতে হয়েছে রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু সমাজের দ্বারা। তবু কিন্তু তিনি পিছপা হননি, হার মানেনি। তিনি নিজের লক্ষ্যে সর্বদা ছিলেন অবিচল। কারণ, তিনি এই অমানবিক প্রথাকে নির্মূল করার ব্যাপারে ছিলেন বদ্ধপরিকর। আর এখানেই আমরা রাজা রামমোহন রায়ের মানবতাবাদী মনোভাব যে কত গভীর ছিল তার পরিচয় পাই। অসহায় তৎকালীন নারীদের যন্ত্রণা, কষ্ট ভীষণ ভাবে তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। আর আজকের এই সুন্দর পৃথিবীতে যেখানে আমরা প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি তা তাঁদেরই মতো বিভিন্ন মানবদরদী মনীষীদের দেওয়া উপহার। তাঁদের দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল যার আস্বাদ আমরা আজ গ্রহণ করছি। তাঁদের অক্লান্ত, নির্ভীক ও দৃঢ় লড়াই আমাদের কাছে সর্বদাই প্রণম্য। এরজন্য যতই আমরা ওঁনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হই না কেন তা যেন কমই মনে হয়।

এই সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। তাঁর হস্তক্ষেপে এই আন্দোলনে গতি বৃদ্ধি হয় এবং এক নতুন মোড় আসে এই লড়াইয়ে। মানবতাবাদী লর্ড বেন্টিঙ্কও এই প্রথা উচ্ছেদে দৃঢ় সংকল্প হন। আর এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল আইনের ব্যবস্থা করা। আইন প্রণয়নের পূর্বে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিদের মতামত জানতে চান এ বিষয়ে। যেমন- বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, দেশীয় লোকজন ইত্যাদি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। বহু আপেক্ষিত সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ আইন ঘোষিত হয় ১৭ নম্বর রেগুলেশন আইন দ্বারা। স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন সমাজে এর ফলে এক তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়। তারাও এটিকে এত সহজে মেনে নিতে পারেনি। তারা গণস্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন পত্র সরকারের কাছে জমা দেয় এই প্রথা বহাল রাখার জন্য। রাজা রামমোহন রায়ও কিন্তু চুপ থাকার ব্যক্তি নন। তাই তিনিও গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র জমা দেন এই প্রথা নির্মূলের জন্য। এই ভাবে দীর্ঘ লড়াই চলতে থাকে উভয়পক্ষের মধ্যে অর্থাৎ তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজ এবং রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর সমর্থনকারীদের মধ্যে। রাজা রামমোহন রায় এরপর বিলাতযাত্রা করেন যাতে করে এই সতীদাহ প্রথা রদের আইন বাতিল না হয়ে যায়। ফলস্বরূপ ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিল বাংলার গভর্নর উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের আইন বলবৎ রাখেন।[১৩] যার ফলে তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে এই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তা বাংলার প্রথম সমাজ সংস্কার আন্দোলন কারণ, এর দ্বারা বহু বছরের পুরনো এক পাশবিক প্রথার অবসান ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিল। নারী জীবনের অন্ধকারে এ যেন এক টুকরো আলো। কারণ নারীরা সমাজে সবসময়ই অবহেলিত। নারীদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায় আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থন্বেষী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। প্রকৃতপক্ষে, নারী জীবনে বৈষম্য শুরু হয় কিন্তু তার জন্ম মুহূর্ত থেকেই। আমাদের ইতিহাস আসলে নারী অবদমনের ইতিহাস। সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। নারীকে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলত এবং আজও যে সেটা এক্কেবারে নিশ্চিহ্ন বা নির্মূল হয়ে গেছে তা খুব একটা জোর গলায় আমরা কিন্তু বলতে পারি না। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সমস্ত জীবনটাই ছিল নারীদের বৈষম্যপূর্ণ। সতীদাহ প্রথা রদের দ্বারা নারীদের বাঁচার অধিকার রক্ষিত হয়েছিল। কারণ, প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে। এই প্রথা রদের ফলে বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সতীদাহ আন্দোলনের দ্বারা নারীদের জীবনের শুধু যে সংস্কার সাধিত হয়েছিল তাই নয়। নারীদের জীবনের সংস্কারের দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছিল। নারীদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা মানবদরদী রাজা রামমোহন রায়কে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই তিনি নারীমুক্তি ও নারীকল্যাণের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। আর তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হল এই সতীদাহ প্রথা রদ। তিনি শুধু যে নারীর জীবন রক্ষা করেছিলেন তাই নয়। তিনি সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার, নারীকে মর্যাদা প্রদান, বিধবা বিবাহের প্রচলন, নারীশিক্ষা প্রভৃতি নারীমুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিতে তৎপর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নারী মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতেই হয় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর এর জন্য তিনি পশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সমাজের প্রকৃত সংস্কারের দ্বারাই নারীমুক্তি সম্ভব হতে পারে।

যথোপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার হল এক প্রকার মানবাধিকার। কেবলমাত্র মানুষ হিসাবে জন্মানোর জন্যই সকল মানুষের যে অধিকার তা হল মানবাধিকার। এটা জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার জন্য একজন মানুষ যে সমস্ত অধিকারগুলি ভোগ করে তা হল মানবাধিকার। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতেও এই মানবতার জয়গান শোনা যায়। যেমন উপনিষদে বলা হয়েছে — শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ...।[১৪] নারীর বাঁচার অধিকারও কিন্তু এক প্রকার মানবাধিকার যা নারীর কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ নির্মম সতীদাহ প্রথা দ্বারা। আর, মানবতাবাদী রাজা রামমোহন রায় নারীদের সেই মানবাধিকারকেই সংরক্ষিত করেন সতীদাহ প্রথা রদ দ্বারা। মানুষের প্রকৃত ধর্মকে মানবতা বলা হয়। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলিতেও আমরা এই

মানবতারই বাণী শুনতে পাই। নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর মানবতারই পরিচয় মেলে পরতে পরতে। মানবতাবাদ হল এক দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ যেখানে মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা ভাবা হয়, সকল মানুষকে সমান ভাবা হয়। আত্মকেন্দ্রিকতা নয় বরং সকলের কল্যাণসাধনই এর লক্ষ্য। প্রত্যেক মানুষকে মানুষরূপে মূল্য দেওয়া হল মানবতা। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একজন মানবতার পূজারী এবং মানবতার আদর্শরূপ। তাঁর ধর্ম ছিল মানবতার ধর্ম বা মানব ধর্ম। তাই তিনি সতীদাহের মতো এক নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথাকে কোন মতে মেনে নিতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত সেটির উচ্ছেদও ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাজা রামমোহনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অদ্বৈতবাদ ও মানবতাবাদ। মানবতাবাদ হল দর্শনেরই এক প্রকার। নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ অবদান হল এই মানবতাবাদী দর্শন। মানবতাবাদের মূলমন্ত্র — মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের মঙ্গলসাধন করা।[১৫] প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যে অমানবিকতা, স্বার্থান্বেষী মনোভাব তা রাজা রামমোহন রায় কোন মতে মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয় তাও তিনি সহ্য করতে পারেনি। ধর্মের নামে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের ছিলেন তিনি তীব্র বিরোধী। কারণ, এই ধর্ম মানুষের মুক্তির পরিপন্থী। রাজা রামমোহনের এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি ছিল বেদান্ত দর্শন। তাঁর মতে, বেদান্তে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম আমাদের। গীতা, বেদ, বাইবেল, কোরান, হাদিস, উপনিষদ, ত্রিপিটক, জেন্দ আবেস্তা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঈশ্বর হলেন এক ও অভিন্ন। যিনি সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে দেখতে পান তিনি কাউকে কখনো ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন না। আধুনিক তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের সূচনাও তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল। একেশ্বরবাদ মানুষকে মুক্তির পথ দেখায় এবং সেই পথকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করে। আর, মানুষকে মুক্তিলাভে সহায়তা প্রদান করে।

উপসংহার — যখনই স্বার্থান্বেষী, আত্মকেন্দ্রিক কিছু মানুষের সংকীর্ণ মনোভাবের দ্বারা আমাদের সমাজ কলুষিত হয়ে ওঠে তখনই আমাদের দেশের বুকে মনীষীদের উত্থান ও আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও ক্ষতিকর প্রথার অবসান ঘটিয়ে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক এবং কাঙ্খিত পরিবর্তন আনাকেই বলা হয় সমাজ সংস্কার। সমাজের উন্নতি ও প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ প্রথা, রীতিনীতি ও গোঁড়ামীকে সমূলে উৎপাদিত করাই হল সমাজ সংস্কার। আর যাঁরা এই সমাজ সংস্কার করার জন্য এগিয়ে আসেন এবং যাঁদের হাত ধরে সমাজে সংস্কার আসে তাঁরা হলেন সমাজ সংস্কারক। তৎকালীন হিন্দু ধর্ম যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সেই সময় আবির্ভাব হয় সমাজ সংস্কারের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের। তাঁর আধুনিক মনোভাবের আলো সমাজের অন্ধকার ভেদ করে পৌঁছে গিয়েছিল গভীরে। তাঁর জোরালো যুক্তি বহু বছর ধরে সমাজে প্রচলিত থাকা কুসংস্কারগুলির গোঁড়া নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং অবশেষে সতীদাহর মতো এক অমানবিক প্রথার বিনাশও ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যেকার সময়ে হিন্দু সমাজে নেমে এসেছিল কুপমন্ডুকতা। যেমন – অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, কুলিন প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি। এগুলির বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান। তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব হল সতীদাহ প্রথা রদ যা তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল যা তিনি আমাদেরকে উপহার হিসেবে দিয়ে গেছেন। তিনি নারীমুক্তির জন্য আন্দোলন করেছিলেন। মানবতাবাদী রাজারামমোহন রায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও নারীশিক্ষার কথা বলেছিলেন। শিক্ষাই একমাত্র পারে নারীদের জীবনে সমাজ কর্তৃক আরোপিত অভিশাপগুলিকে দূর করতে। মানবতাবাদ-ই তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি ছিল। তিনি তাঁর চিন্তা ও কর্মের দ্বারা এক সংস্কাররূপ মশাল জ্বেলে ছিলেন সমাজের অন্ধকারকে দূর করার জন্য। যার ফলে নবজাগরণের দিকে আমরা এক ধাপ এগোতে পেরেছিলাম। তিনি সকল মানুষকে সমান মনে করতেন। একেশ্বরবাদী রাজা রামমোহন রায় সকলকে সেই ঈশ্বরের সন্তান বলে মনে করতেন। তাঁর একেশ্বরবাদের প্রতি বিশ্বাস, বেদান্তের অনুসরণ, নারী - পুরুষের সমাধিকার, নারী মুক্তির জন্য লড়াই, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই — এই সবই তাঁর মানবতাবাদ প্রমাণের নিদর্শন এবং তিনি যে একজন কত বড় মানবতাবাদী ছিলেন তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে। তাঁর দর্শন হল মানবতার দর্শন।

তাঁর ধর্ম মানবতার ধর্ম। ধর্মের সংস্কারের দ্বারা তিনি তৎকালীন সমাজকে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তাই বলা যায় যে, মানবতারূপ ধর্মের দ্বারা তিনি এক মানবকেন্দ্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের মানুষ হিসাবে প্রাধান্য ও মূল্য থাকবে। যে সমাজে কেউ না নারী, না পুরুষ, না ব্রাহ্মণ, না শূদ্র। সবার একটাই পরিচয় তা হল তারা সবাই মানুষ। রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা, কর্ম প্রভৃতি সমস্ত কিছু যেন এক সুন্দর মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেয় সমাজে। তাই তাঁকে একজন প্রকৃত মানবতাবাদী বলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভারত পথিক রামমোহন রায়, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯, পৃ. ১৯
২. রথ, হরিপদ, একাদশের দর্শন শাস্ত্র, কলকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, এপ্রিল, ২০১৪, পৃ. ৯৭
৩. bn. vikaspedia.in
৪. milansagar. com
৫. ঐ
৬. https://www.historyclassrooms.com.
৭. ঐ
৮. সামন্ত, ড: বিমলেন্দু, দর্শন পরিচয়, কলকাতা, ছায়া প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০১৬,পৃ. ১৭১
৯. https://www.bhangarmahavidyalaya.in.
১০. www.historyclassrooms.com.
১১. Sangbadpratidin.in , 22 May, 2022
১২. বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী, রাজনীতি ও নারীশক্তি ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, জুন, ২০১৯, ISBN 81-80641-48-1,পৃ. ২৩
১৩. www.historyclass.com
১৪. চট্টোপাধ্যায়, সুহাস, বিপন্ন মানবাধিকার এই সময়ের ভাবনা, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, আগস্ট, ২০০৭, ISBN : 81-89846-00-0, পৃ. ৯
১৫. Jagobangla.in, May 22, 2022